|| সহযজ্ঞাঃ || এক যাজন পুস্তিকা

শ্রী প্রবোধচন্দ্র মিত্র

সহযজ্ঞাঃ **Sahajagna.**

অষ্টপঞ্চাশত্তম (৫৮তম) যাজন পুস্তিকা

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৯০

প্রকাশকঃ শ্রী প্রবোধচন্দ্র মিত্র, লালপুর, চাকদহ, নদীয়া, পিন - ৭৪১২২২

মুদ্রণঃ বণিক প্রেস, রথতলা, চাকদহ, নদীয়া

দক্ষিণাঃ যদৃচ্ছা সাহায্য

প্রেরণাঃ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ গিধনী, মেদিনীপুর।

সহযজ্ঞা শব্দের অর্থ যজ্ঞের সহিত| গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের উক্তিরূপে আছে| গীতা যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উক্তি হয়, তবে তিনি যে একজন পরম সমাজ-বিজ্ঞানী ছিলেন এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় | গীতা হুবহু ঐ ভাষায় ঐ ভাবে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও গীতা যে তাঁর প্রবর্তিত ধর্মমত 'ভাগদ্ধর্মের' দার্শনিক তত্ত্বের সার সঙ্কলন তাতে কোন সন্দেহ নেই| সেই ভাগবদ্ধর্ম খ্রীঃ পূঃ তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রবর্তিত হয়ে প্রায় দু'হাজার বৎসর ধ'রে ভারতে প্রচলিত ছিল| সেই ধর্মমত বিকৃত হ'য়ে গেলে প্রথমে নাথ ধর্ম, তৎপরে খ্রীঃ পূঃ পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধ ধর্ম প্রবর্তিত হয়| মনে হয় সেই নাথ ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম প্রবর্তিত হবার পুর্ব্বেই ব্যাস বংশীয় কোন ব্যাসদেব মহাভারত রচনা করেন| মনে হয় তিনিই সেই ভাগবদ্ধর্মের সার সঙ্কলন ক'রে মহাভারতে সন্নিবেশ করেন| তৎপূর্ব্বেও যে গীতা নামে কোন গ্রন্থ প্রচলিত ছিল এমন প্রমাণ এখন পর্য্যন্ত পাওয়া যায়নি| সম্ভবতঃ মহাভারতের অঙ্গ হিসাবেই গীতা প্রথম সঙ্কলিত হয়| তাহলেও গীতা যখন শ্রীকৃষ্ণ প্রবর্তিত ধর্ম্মমতেরই সার সঙ্কলন, তখন গীতার মূল প্রবক্তা শ্রীকৃষ্ণই |

গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের দশম শ্লোকে, শ্রীকৃষ্ণের উক্তি ব'লে বর্ণিত আছে

"সহযজ্ঞাঃ প্রজা সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ

অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষু বোহস্তিষ্ট কামধুকঃ"

অর্থাৎ সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রজাপতি যজ্ঞের সাথে প্রজা সৃষ্টি করে বলেছিলেন যে–তোমরা এই যজ্ঞ দ্বারা উত্তরোত্তর বর্ধিত হও, এই যজ্ঞ তোমাদের অভীষ্ট কাম্য ফল প্রদান করবে| কিন্তু এই যজ্ঞ কি, যজ্ঞ বলতে শ্রীকৃষ্ণ কোন কর্ম বোঝাতে চেয়েছিলেন, তা আমাদের বোঝা দরকার | নাহলে শিব গড়তে বানর হয়ে যেতে পারে |

যজ্ঞ শব্দের নানা রকম ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে| কেউ বলেন শ্বাস প্রশ্বাসই যজ্ঞ, এই শ্বাস প্রশ্বাসের সাথেই জীব জন্মগ্রহণ করে| এই শ্বাস প্রশ্বাসকে নিয়ন্ত্রণ করে মানুষ বহু বিভূতি লাভ করতে পারে|সুতরাং, তারা বলেন, প্রাণায়ামাদি করাই যজ্ঞ| এই ব্যাখ্যায় আপত্তি এই যে, কেবল মানুষ নয়, পশু-পাখীরাও শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু তাদের শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের কথা কোন পাগলেও চিন্তা করতে পারে না| তাছাড়া ভারতের বাইরে প্রাণায়ামাদির কোন প্রচলন নেই, সেখানকার প্রজাদের কি

প্রজাপতি সৃষ্টি করেন নি? হোম যজ্ঞাদি বলতে আমরা যা দেখি তাও তো হিন্দু সমাজের বাইরে আর কোথাও প্রচলিত নেই | তারাও কি তবে প্রজাপতির সৃষ্ট নয় ? এমন হতে পারে না যে প্রজাপতি কেবল হিন্দুই সৃষ্টি করেন, বিশ্বের আর কোন জাতির মানুষকে নয়| এমন মনে করা অযৌক্তিক, অবৈজ্ঞানিক ও অবাস্তব| তাহলে যজ্ঞ বলতে কি বুঝবো, কিসের সাথে প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি ক'রে বললেন যে এই যজ্ঞ দ্বারা তোমরা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি লাভ করো | তাহলে কি সেই জিনিষ যা তিনি যজ্ঞ বলে অভিহিত করলেন?

যজ্ঞ শব্দটি শ্রীকৃষ্ণ ব্যবহার করেছিলেন পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে, শব্দটি আরও প্রাচীন, বেদ উপনিষদেও এই শব্দের ভূরি ভূরি প্রয়োগ আছে| শব্দ যখন সৃষ্টি হয়, তখন তার অর্থও মানুষের জানা থাকে, তাই তার ব্যাখ্যা নিয়েও কোন মতান্তর থাকে না | কালক্রমে নানা আচার আচরণ এবং প্রবৃত্তির প্ররোচনায় মানুষ যখন আদর্শভ্রষ্ট হয়, কালের দীর্ঘ ব্যবধানে ভাষারও পরিবর্তন ঘটে, তখনই মানুষ জীবনের পথ হারায়| শব্দগুলি টিকে থাকে লেখার মাধ্যমে | তখন প্রবৃত্তিমুগ্ধ মানুষ শব্দের মর্মার্থ ভুলে যায়| অথচ সেই শব্দগুলি নিয়ে যখন চলতে হয়, তখনই মনগড়া ব্যাখ্যার সৃষ্টি হয়| মানুষের জীবনচর্যার পরিবর্তন ও তারতম্যে, তার বুদ্ধি, মননশীলতা ও জ্ঞানেরও

পরিবর্ত্তন ঘটে। তখন প্রবৃত্তিতাড়িত, অহংমত্ত মানুষ আপন মত ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য জ্ঞান ও বুদ্ধির সাহায্যে নানা রকম মনগড়া ব্যাখ্যা সৃষ্টি করে। কিন্তু সেই সব পণ্ডিতদের জ্ঞান কোন উপলব্ধিসঞ্জাত জ্ঞান নয়, পুঁথিগত বাচকজ্ঞান মাত্র।

তাদের জীবনে কোন দ্রষ্টা পুরুষও গুরু বা আদর্শরূপে নেই। তাই তাঁদের মতামতের মধ্যেও কোন সত্য থাকেনা, আর সত্য থাকে না বলেই সেগুলি হয় বিচিত্র, বিভিন্ন ও একদেশদর্শী সেইজন্যই গীতা বা অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থের ভাষ্য এত বহু ও বিভিন্ন। না হলে মূল বাণীগুলির উদগাতা বা প্রবক্তাগণ এক উদ্দেশ্যেই এক একটি শব্দ প্রয়োগ করেছিলেন। নিশ্চয়ই, বহু মতলব নিয়ে লোক-মানসে বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তাঁরা কেউ কোন শব্দ প্রয়োগ করেন নি। তবু আজ যে তার বহু ভাষ্য ব্যাখ্যা হচ্ছে তার কারণই ব্যাখ্যাতাগণের অনুভূতিহীন বাচকগণের তারতম্য। সমাজে আত্ম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নিজেদের বোধ ও মননশীলতার ব্যভিচার ঘটিয়ে তাঁরা প্রত্যেকে এক একটা মনগড়া ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। এদিকে মূল সংস্কৃত ভাষাটিও জন সমাজে

প্রায় অপ্রচলিত হওয়ায় জনসাধারণকেও ভাষ্যের উপর নির্ভর করা ছাড়া গত্যান্তর থাকছে না। তারই ফলে আসছে অর্থ-বিভ্রম।

যজ্ঞ শব্দটিও এমনই একটা শব্দ । সুদীর্ঘ কালের ব্যবধানে শব্দটি তার মর্ম হারিয়ে নানা রকম অর্থ পেয়েছে। সে সব অর্থের অধিকাংশই বিচার ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে টেকে না। যতক্ষণ না ব্যাখ্যাটি যুক্তিসম্মত, বুদ্ধিগ্রাহ্য ও সার্ব্বজনীন ততক্ষণ সে ব্যাখ্যা একদেশদর্শী, তাতে পূর্ণসত্য প্রকাশ পায় না। এমন দেখা যাক গীতার ঐ যজ্ঞ শব্দের ভাবার্থ কি? তার সঠিক পা তাৎপর্য্য যদি অনুধাবন করা যায়, তবে তার পরবর্তী উক্তির সাথেও সেটা সঙ্গতিপূর্ণ হবে।

যে কোন শব্দ বহু ব্যবহারে জীর্ণ ও বিকৃত হ'লেও তার মর্মার্থ ধরা থাকে তার ধাতুতে। তাই তাকে বলে ধাতু অর্থাৎ মূল মর্ম ধারণকারী। যজ্ঞ শব্দটি এসেছে 'যজ্' ধাতু থেকে। অভিধানে যজ্ ধাতুর অর্থ পূজা, দান, ক্রীড়া, মিলন, ইত্যাদি। গীতাকার পুরুষোত্তম-সাদৃশ সঙ্গতিকরণ বর্তমান পুরুষোত্তম শ্রী শ্রীঠাকুর

অনুকূলচন্দ্র এই অর্থগুলির মধ্যে মিলন ও সঙ্গতিকরণ অর্থটি গ্রহণ ক'রে বললেন- "সঙ্গতিকরণ বা মিলনের চেষ্টা ও ব্যবস্থা যদি না থাকে, সেখানে যজ্ঞ সার্থক হয়ে উঠে না|"

যজ্ঞার্থের মধ্যে পূজা শব্দও আছে| পূজা মানে কেবল ফুল ফেলা, জল ছিটানো, ঘন্টা নাড়া নয়, পূজা মানে বর্ধনা - পূজ্ ধাতু বর্ধনে| যে অনুষ্ঠানের ফলে জনচিত্তে তাদের অজ্ঞাতেই, | পূজ্যের ভাব বৃদ্ধি পায়, তাই পূজা| উৎসব মানেও তাই | আবার যে প্রচেষ্টার ডাকে জনসাধারণের মধ্যে একটা উৎ বা উৎকর্য বা শ্রেয়ের ভাব জাগে, আনন্দের ভিতর দিয়ে, রসের ভিতর দিয়ে মানুষ নিজ অজ্ঞাতেই উৎ, শুভ বা শ্রেয় নীতিগুলি আয়ত্ত করে তাকেই বলে উৎসব| এই জন্য যজ্ঞের সাথে উৎসবের সম্বন্ধ প্রায় অঙ্গাঙ্গী| কোন বৃহৎ মঙ্গলোদ্দেশ্যে যখন বহু মানুষ মিলিত হয় এবং সেই একই উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ করার জন্য যখন সকলে সঙ্গত চলনে চলে, বাক্য ও কর্ম বিনিয়োগ করে, তখন সেই উৎসমুখী জনতার অনুষ্ঠানকেই যজ্ঞ বলা যায়| একটা হাটখোলায় বহু গ্রহণ মানুষ একত্র হলেও তাকে যজ্ঞ ভূমি বলা হয় না, কারণ কোন বৃহৎ

কল্যাণের আমন্ত্রণে তারা সেখানে সমবেত হয়নি, তাদের প্রত্যেকের প্রয়োজনও পৃথক । কিন্তু একটা বিয়ে, অন্নপ্রাশন বা উপনয়নের অনুষ্ঠানে যখন অল্প লোকও মিলিত হয় এবং সেই অনুষ্ঠানটিকেই সাফল্যমণ্ডিত করতে তারা সকলে মিলিতভাবে বাক্য ও কর্মে সঙ্গত আচরণ করে তখন সেই অনুষ্ঠানকেই যজ্ঞ বলা যায়। সঙ্গত আচরণ মানে (সম+ গত= সঙ্গত) সম্যক চলন বা চেষ্টা করণ।

এই মিলন বা সংযুক্তি করণের আনুষ্ঠানিক রূপ নানা দেশে নানা রকম হতে পারে বা হয়েছে। ভারতে এই রূপ পূজা, হোম, সেবা, তর্পণ ইত্যাদি রূপে যজ্ঞ এই সাধারণ শব্দের নামে করা হতো, অন্য দেশে হয়তো সভা, সমিতি, মজলিস ইত্যাদি নামে সংগঠনের মাধ্যমে সেই একই কাজ করা হতো। মূল উদ্দেশ্য মানুষের সঠিক কল্যাণের জন্য, মানুষের মিলিত ভাবে কাজ করবার যে মনোভাব তাই যজ্ঞীয় ভাব। এটা পশুর প্রায় নেই বললেই হয়। স্রষ্টা বা প্রজাপতি কেবল মানুষকেই এই মনোভাব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, কোন মনুষ্যেতর প্রাণীকে দেননি। তাই বলা যায় প্রজাপতি

মানুষকে সহযজ্ঞা বা যজ্ঞের সাথে সৃষ্টি করেছেন, কোন মনুষ্যেতর প্রাণীকে নয় ।

এই যজ্ঞীয় বা মিলনের মনোভাব দেওয়া এবং না দেওয়ার ফলে মানব ও পশু সমাজের একটা আকাশ পাতাল পার্থক্য ঘটে গেছে। অবশ্য স্রষ্টা মানুষকে কেবল মিলনের মনোভাবই দেননি, সেই ভাব কার্যকরী করার জন্য তাকে বাকশক্তি, স্মৃতি ও বিচার বুদ্ধিও যেমন দিয়েছেন, তেমনি উন্নত ইন্দ্রিয়, উন্নত দেহ-বিধান ইত্যাদিও দিয়েছেন।

এই দান পেয়েই মানুষ আজ এত বড় হয়েছে। সৃষ্টির আদিতে পশুও যেমন কেবলমাত্র আহার, বিহার ও আশ্রয় নিয়ে ব্যস্ত ছিলো, অন্য কোন দিকে মন দেবার মতো সময়, শক্তি, বুদ্ধি, বা সুযোগ কোনটাই তার ছিলো না, আজও পশু তাই আছে। মানুষও আদিকালে পশুর মতোই পরস্পর বিচ্ছিন্ন, বিবদমান ও একাচারী ছিলো, অথচ ঐ যজ্ঞীয় অর্থাৎ মিলনের মনোভাব থাকার ফলে কালক্রমে সেই মানুষ পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র ইত্যাদি সৃষ্টি করেছে, এক সময়ের গুহাবাস ছেড়ে আজ প্রায় গগনবাসী হতে চলেছে, আদিম জীবনের পদে পদে বিপন্নতার বাধা অপসারিত করে যজ্ঞের দ্বারা অর্থাৎ সকলের সম্মিলিত প্রয়াসের দ্বারা আজ সে পদে পদে সম্পদ সৃষ্টি ক'রে বৃদ্ধির দিকে

এগিয়ে চলেছে। মানুষ যদি তার একাকীত্বের মোহ কাটিয়ে উঠে পারস্পরিক মিলনের পথ খুঁজে না পেত তাহলে তারও কোন উন্নতিই ঘটতে পারতো না। যেমন এক খোয়াড়ে বাস করলেও একটা মুরগী একটা হাঁসের সাথে দু'টো সুখ-দুঃখের গল্প করছে এমন দৃশ্য কেউ কখনও দেখেও নি, কখনও দেখবেও না, যে মনোভাব উভয়ে মধ্যে সঙ্গতি সাধন ক'রে মিলন ঘটায় সেই যজ্ঞীয় মনোভাব স্রষ্টা তাদের দেননি। যারা যা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেনি তাদের মধ্যে তার প্রকাশ হবে কেমন ক'রে! আর মানুষকে সেই মনোভাব দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে ব'লে পৃথিবীর এক প্রান্তের একজন মানুষের সাথে অপর প্রান্তের একজন মানুষের বন্ধুত্ব হ' তে দেরী হয় না।

মানুষই হোক আর পশুই হোক, বাঁচার আকুতি সকলের মধ্যেই রয়েছে। সেই বাঁচার লওয়াজিমা বা উপাদান মানুষ সংগ্রহ করে তার পরিবেশ-পারিপার্শিক থেকে, পরস্পরের সহায়তায় । পশু এ ব্যাপারে একেবারে স্বাধীন, কিন্তু মানুষ পরস্পরের অধীন। মানুষ তার জীবনের সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করে বিশ্ব-মানবের সেবায়। সে যেমন বাঁচে বিশ্ব মানবের সেবায়, তেমনি তার সেবায় বিশ্ব-মানব বাঁচে। তাই মানুষ প্রত্যেকে

প্রত্যেকের কাছে ঋণী| ফলতঃ মানুষের প্রত্যেকটা প্রাপ্তি প্রকৃতির কাছে এক একটা ঋণ | সে প্রাপ্তি পিতা-মাতার কাছে জন্মগ্রহণই হোক, ভ্রাতা-ভগ্নির স্নেহ ভালবাসা প্রাপ্তিই হোক, পাড়াপড়শীর সাহায্য সহযোগিতা, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রদত্ত নিরাপত্তা ও জীবিকার্জনী সুযোগ লাভই হোক অথবা কারও স্নেহ বা করুণার দানই হোক, সব রকম প্রাপ্তিই পরিশোধযোগ্য ঋণ | এই ঋণ প্রকৃতি বা বিশ্ব বিধানের কাছে| প্রকৃতি ঋণ দেয় যেমন মমতা ভরে, আদায় করে তেমনি নির্ম্মম ভাবে| প্রকৃতি প্রয়োজনে, ঋণ দেয় উদার ভাবে কিন্তু হিসাব রাখে একেবারে কড়া ক্রান্তির | পরিশোধের সময়, স্বেচ্ছায় পরিশোধ না করলে, প্রকৃতি ঋণীর একেবারে যক্ষ পঞ্জর চূর্ণ করেও আদায় করতে ইতস্ততঃ করে না| বিশ্ব-বিধানের এ ব্যবস্থা কিন্তু মানুষের কল্যাণের জন্যই| মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে-সব উৎস থেকে পেয়ে পেয়ে মানুষ বাঁচে ও বাড়ে, যেমন পিতামাতার স্নেহ, পড়শীর সাহায্য, জ্ঞানী গণের নিকট শিক্ষা, সমাজ ও রাষ্ট্রের আরক্ষা ও জীবিকার্জনী ব্যবস্থা, ইত্যাদির ঋণ যদি পরিশোধ না করা যায়, তবে সেই উৎসগুলি শুষ্ক, শীর্ণ অবসন্ন হয়ে যায়, একেবারে রুদ্ধও হয়ে যেতে পারে, তাহলে মানুষের বাঁচা ও বেড়ে উঠাও অবসন্ন ও রুদ্ধ হয়ে যাবে| তাই মানুষের কল্যাণের জন্যই উৎসগুলিকে পুষ্ট ও পোষণপ্রদ ক'রে রাখা দরকার| এই ব্যবস্থা প্রকৃতির হাতে ব'লে প্রকৃতি যেমন

উদারভাবে দেয় তেমনি নিষ্ঠুরভাবে আদায় করে। তাই একটা মানুষেরই হোক, একটা সম্প্রদায়েরই হোক বা একটা জাতিরই হোক, তার উন্নতি ও প্রগতির অধিকার নির্ভর করে, এই জগৎকে কতটা সে দান করে তার উপর, জগৎ থেকে সে কতটা গ্রহণ করে, তার উপর নয়।

প্রকৃতির কাছে ঋণী থাকা কারও পক্ষেই কল্যাণপ্রদ নয়। ভারতীয় সমাজে এই ঋণশোধের একটা আনুষ্ঠানিক রূপ দিয়েছিলেন ঋষিগণ। তার নামই যজ্ঞ । এই যজ্ঞ ব্যবস্থা ভারতে অতি প্রাচীন। তবে মনে হয় শ্রীকৃষ্ণ প্রবর্তিত ভাগবদ্ধর্মে সেই যজ্ঞের একটা সুস্পষ্ট রূপ দেওয়া হয়েছিলো, যা প্রত্যেক মানুষের নিত্য এবং অবশ্য করণীয় ব'লে নির্দিষ্ট ছিল। তাকে বলা হতো পঞ্চমহাযজ্ঞ। সেগুলি হলো ঋষিযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, মানুষ যে যে উৎস থেকে পেয়ে বাঁচে ও বড় হয় সেগুলিকেই কেন্দ্র করে এক একটা যজ্ঞের নামকরণ ও কৃত্যাদি নির্ধারিত হয়েছে।প্রত্যহ এই যজ্ঞানুষ্ঠান না ক'রে যে অন্ন গ্রহণ করে, শ্রীকৃষ্ণ তাকে বলেছেন– "স্তেন এব সঃ" সে নিশ্চয়ই চোর । যে নিজের উপার্জ্জন কেবল নিজেই ভোগ করে, তার সম্বন্ধে সেই পরম সমাজ-বিজ্ঞানী বললেন "ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্ম কারণাৎ" অর্থাৎ যে

কেবল নিজের জন্যই পাক করে সেই পাপী পাপ ভোজন করে। অর্থাৎ তারা রক্ষা পায় না । আর যারা এই যজ্ঞশেষ ভোজন ক'রে তারা পাপ থেক মুক্ত থাকে। পাপ শব্দের অর্থ হলো সমস্ত রক্ষা ব্যবস্থা থেকে পাতিত হওয়া। আর পাপ থেকে মুক্ত থাকা মানে ঈশ্বর-প্রকৃতির স্বাভাবিক রক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত থাকা। সেই পঞ্চ মহাযজ্ঞের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে একটু আলোচনা ক'রে বিষয়টা পরিস্কার করার চেষ্টা করি।

ঋষিযজ্ঞ — মানুষ কেবল পশুর মতো তার বোধির (Intution) সাহায্যে চলেনা, সে চলে তার বুদ্ধির (Intellect) সাহায্যে। সেই বুদ্ধির উৎস হ'ল তার শিক্ষা। সেই শিক্ষার প্রধান উপকরণই হলো প্রাচীন জ্ঞানীগণের রেখে যাওয়া অভিজ্ঞতা সম্বলিত পুস্তক। সেই জ্ঞানের পুস্তককেই বেদ বলা যায়, কেবল কোন গ্রন্থ বিশেষই বেদ নয়। বেদ শব্দের অর্থই জ্ঞান । প্রাচীন দ্রষ্টা পুরুষগণের উপলব্ধিজাত জ্ঞানের পুস্তককেই সাধারণতঃ বেদ বলা হয়। সেই বেদ নিত্য পাঠ ও নৈমিত্তিক ভাবে সেই দ্রষ্টা পুরুষগণের শ্রাদ্ধ ও তর্পণের মাধ্যমে স্মরণ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশই ঋষিযজ্ঞ। শ্রাদ্ধ মানে শ্রদ্ধার সাথে কিছু উৎসর্গ করা। শ্রদ্ধাবানই জ্ঞানলাভ করে। শ্রদ্ধাহীনের সমস্ত জ্ঞানই বৃথা ও বিপথগামী। জ্ঞানের উৎস-পুরুষের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত আনুগত্য না

থাকলে তাঁর উপলব্ধিজাত জ্ঞানের মর্মও শ্রদ্ধাহীনের চিত্তে অনুভূত হয় না। তাই যেমন নিত্য কিছু জ্ঞান গ্রন্থ পাঠ গণ করা তেমনি বিশেষ দিনে শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করাই ঋষিযজ্ঞ।

দেবযজ্ঞ -- দেবতা কথার তাৎপর্য্যই আমরা ভুলে গিয়েছিলাম। সেই তাৎপর্য্য ধরিয়ে দিলেন বর্তমান পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র। দেবতা কথাটি এসেছে 'দিব্' ধাতু থেকে। দিব্ ধাতুর অর্থ দীপ্তি, কান্তি, ক্রীড়া প্রভৃতি। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন -"যিনি সেবা ও সাহচর্য্যে মানুষের জীবন-বুদ্ধিকে উদ্দীপ্ত করিয়া প্রত্যেক হৃদয়ে দীপ্তিমান' তিনিই দেবতা। অর্থাৎ যারা উন্নত মেধার অধিকারী, ও জ্ঞানী, গবেষক, আবিষ্কারক প্রভৃতি তাঁরাই দেবতা। তাহলে আকাশের ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, বায়ু ইত্যাদি নয়, যারা জ্ঞান ও গবেষণার সাহায্যে মানুষের জন্য কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, আরক্ষা প্রভৃতির উন্নততর ব্যবস্থা আবিষ্কার ও প্রবর্তন করে মানুষের কল্যাণ সাধন করেন, তাঁরাই দেবতা। তাঁদের তৃপ্তি, পুষ্টি ও পোষণের জন্য বাস্তবে কিছু করাই দেবযজ্ঞ।

প্রাচীন ভারতে বিদ্যা বিক্রয় করা পাপ বলে গণ্য হতো। জ্ঞানীরা তাঁদের গবেষণা-লব্ধ ফল জাতির হাতে তুলে দিতেন। এখনকার মতো পেটেন্ট নিয়ে বিক্রয় করতেন না। ফলে তাঁদের আবিষ্কৃত বস্তু বহুজনে

প্রস্তুত করতে পারতো এবং তাতে একটা সুস্থ প্রতিযোগিতা থাকতো | মানুষ ন্যায্য মূল্যে সে বস্তু কিনতে পারতো, বস্তুরও গুণগত মান ক্রমোন্নত হতো | এখন পেটেন্ট নেওয়া বস্তুর উৎপাদন মূল্য এক পয়সা হলেও বিক্রয় মূল্য হাজার পয়সা করলেও আইনে কোন বাধা নেই| সুতরাং জনসাধারণকে ভীষণভাবে শোষণ করতেও কোন বাধা নেই| যখন বিদ্যা বিক্রয় করা হতো না, তখন জনসাধারণ উপকৃত হতো ঠিকই, কিন্তু সেই গবেষক আবিষ্কারকদের জীবিকার ব্যবস্থা কি ছিলো? তাঁরা তো নিজের জন্য কিছু উপার্জন করতে পারতেন না| তাই তাঁদেরকে সবল ও সক্ষম রাখার জন্য জনসাধারণ স্বেচ্ছায় নিত্য কিছু ভোজ্যাদি উৎসর্গ করতো| তাকেই বলতো দেবযজ্ঞ| সেই সব দেবতারা সেই যজ্ঞের ভাগ পেতেন| তবে যারা বিদ্যা বিক্রয় করতেন তারা দেবতা হলেও পতিত ব’ লে গণ্য হতেন| যেমন দেব চিকিৎসক অশ্বিনী কুমারদ্বয় (অশ্বিনী ও বেরন্ত) চিকিৎসা ক'রে মূল্য নিতেন বলে দেবসমাজে পতিত ছিলেন, যজ্ঞ ভাগও পেতেন না| এই ভাবেই দেব ঋণ শোধ হতো| এমন আশ্চর্য্য পারস্পরিক স্বার্থবন্ধনে আবদ্ধ সমাজ-পরিকল্পনা বিশ্বে আর কোথাও দেখা যায়নি| যেহেতু পাশ্চাত্য সমাজে এমন উদার ও নিঃস্বার্থ সমাজ ব্যবস্থা কল্পনা করতে পারেনি, তাই পশ্চিমের হঠাৎ

আলোর ঝলকানিতে অন্ধ আমাদের চোখেও এর অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য ও মহত্ত্ব ধরা পড়ে না। নাহলে বর্তমানের কম্যুনিজমও এতখানি উদার ও মহৎ নয় ।

আজ আমদের দেবযজ্ঞ নাই, তাই পতিত দেবতাদের শোষণ যজ্ঞের বলি হচ্ছে জনসাধারণ। বর্তমান যুগে দেবযজ্ঞের উপযোগিতা আর নেই, তাই বর্তমান পুরুযোত্তম প্রাচীন পঞ্চ মহাযজ্ঞের স্থলে যে ত্রিযজ্ঞ, যজন, যাজন, ইষ্টভৃতির প্রবর্ত্তন করেছেন, তাতে উক্ত পঞ্চ মহাযজ্ঞের সব তাৎপর্য্য নিহিত থাকলেও প্রত্যক্ষভাবে দেবযজ্ঞ ব'লে কিছু নেই। এখন বুদ্ধিমানেরা ভেবে দেখতে পারেন, আমাদের দেবযজ্ঞ থাকাই লাভের ছিল, না লোভ ও শোষণ যজ্ঞের বলি হওয়াই লাভের হয়েছে।

পিতৃযজ্ঞ- মানুষের প্রথম প্রধান ও প্রকৃষ্ট প্রাপ্তিই ঘটে পিতা মাতার কাছে। সেই ছাড়া কোন সন্তানের বাঁচা তো দূরের কথা, জন্মই হ'তে পারতো না । তাই তাঁদের কাছে সন্তান মাত্রেরই বৃহৎ ঋণ থাকে। সেই ঋণ শোধের ব্যবস্থা যদি না থাকতো তবে পিতা মাতার সন্তানের জন্মদান, মানুষ ক'রে তোলা ইত্যাদি কোন বিষয়ে আনন্দ ও আগ্রহ থাকতো না। পিতা মাতা যদি সন্তানকে একটা আপদ ও অনাবশ্যক বোঝা বয়ে মনে করতো, তবে সমাজে তার কি বিষময় প্রতিক্রিয়া হতে পারতো তা বুঝতে কি বেশী বুদ্ধির প্রয়োজন থাকে ? সেই বিপর্য্যয়কে রোধ করতেই পিতৃযজ্ঞ। জীবিত পিতা মাতার ভরণ

পোষণ, সেবা শুশ্রূষা, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, বিধান এবং বিগত পিতৃ পুরুষকে তর্পণ ও শ্রদ্ধাদির দ্বারা স্মরণ-মননকেই বলা যায় পিতৃযজ্ঞের তাৎপর্য্য। বর্ত্তমান পুরুষোত্তম ইষ্টভৃতির সাথে যে পিতৃভৃতি ও মাতৃভৃতির বিধান দিয়েছেন সে এই পিতৃযজ্ঞকেই লক্ষ্য করে।

নৃযজ্ঞ- মানুষের জীবনের যা-কিছু চাওয়া, বিশেষ করে সুখ, শান্তি, স্বাচ্ছন্দ্য ও সমৃদ্ধির সাথে বাঁচা, তার সবটাই নির্ভর করে মানুষের সাহায্য ও সহযোগিতার উপর। তাই মানুষের কাছে ঋণ সীমাহীন। সে মানুষ এদেশের, ও-দেশের সাদা কালো ইত্যাদি নির্বিশেষে বিশ্বশুদ্ধ মানুষের কাছে মানুষ পরস্পর ঋণী। সে ঋণ মানুষ যদি শোধ না করে তবে কেউ আর কারও জীবন-বৃদ্ধির সহায় হবে না, হবে শত্রু। যেখানে পাওয়ার আশা যা নেই, সেখানে দেওয়ারও প্রবৃত্তি নেই। অথচ মানুষের কাছ থেকে না পেলে মানুষের সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি তো দূরের কথা, বাঁচাই সম্ভব হয় না। কিন্তু মানুষের কি দায় যে সে অপরকে সুখ, শান্তি প্রভৃতি দিতে যাবে ! এ বিশ্বের একটা বিধান হলো যে প্রত্যেক ক্রিয়ারই সম-বিপরীত প্রতিক্রিয়া হয়। সুতরাং মানুষের কাছ থেকে আমাকে যদি ঐ সুখ, শান্তি প্রভৃতি পেতে হয় তবে আগে অপরকে ঐসব দিতে হবে। আমি যে মাত্রায় যত খানি অপরের সুখ-শান্তির জন্য করবো, তারই প্রতিক্রিয়ায়, সেই মাত্রায় ততখানি প্রকৃতি আমার

জন্য ব্যবস্থা করবে। সেই করারই আনুষ্ঠানিক রূপ ঐ নৃযজ্ঞ। গৃহাগত অতিথিকে যেমন সেবা শুশ্রূষা করতে হবে, তেমনি উপযুক্ত আপদগ্রস্ত, বিপন্নকে আপদমুক্ত করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে, তা ছাড়া মানুষ কেউ কোথায়ও যেন আপদগ্রস্ত না হতে পারে তারই জন্য নিত্য কিছু উৎসর্গ করা। বর্তমান পুরুষোত্তম ইষ্টভৃতির মাধ্যমে যে ভ্রাতৃ ভোজ্য বা ভূতযজ্ঞের ব্যবস্থা করেছেন তা ঐ উদ্দে সাধনের জন্যই।

ভূতযজ্ঞ – প্রাচীন ভারতে ভূত যজ্ঞ বলতে বোঝাতো পশু ও বৃক্ষাদির সেবা। মানুষের আদিম জীবনের বাঁচা বাড়া ছিলো পশু ও উদ্ভিদের উপর অনেক বেশী নির্ভরশীল, তাই এই দু'টী উৎসের পুষ্টির উপর নজর না দিয়ে তাঁরা পারেননি। তাছাড়া তাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন যে অরণ্য বহুল স্থানে বৃষ্টি বেশী হয়। তাই কৃষি-জীবনে বৃক্ষের গুরুত্ব তাঁরা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, সেই জন্য পরবর্তী কালে বৃক্ষাদির পরিচর্যাও ভূতযজ্ঞ রূপে নির্দিষ্ট হয়েছিলো। গীতায় যে আছে -- 'অন্নাদ ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্ন সম্ভবঃ। যজ্ঞাদ ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম সমুদ্ভবঃ। (গীতা ৩/১৪) অর্থাৎ জীব সকল অন্ন থেকে উৎপন্ন হয়, অন্ন বৃষ্টি থেকে এবং বৃষ্টি যজ্ঞ থেকে সম্ভব হয়, সে কিন্তু ঐ পশু ও বৃক্ষাদির পরিচর্যা লক্ষ্য করেই উক্ত হয়েছিলো বলে মনে হয়। কেননা পশু ও উদ্ভিদ পরস্পরের পরিপূরক। পশুর মল বৃক্ষের

খাদ্য, বৃক্ষের পাতা, ফুল, ফল, পশুর খাদ্য। কেউ কেউ ভাবেন যজ্ঞ থেকে মেঘ হয়, একথাটা অবৈজ্ঞানিক। কিন্তু বর্তমান বিজ্ঞান বলে যে গাছগুলি যেন প্রকৃতির এক স্বতশ্চালিত পাম্প। ভূগর্ভের সঞ্চিত জল টেনে উপরে তুলে বৃষ্টি রূপে ছড়িয়ে দেবার প্রধান হাতিয়ার বৃক্ষগুলি। একটা পঞ্চাশ টন ওজনের বড়সড় গাছ ভূগর্ভ থেকে জল টেনে তুলে, নিজের প্রয়োজন মিটিয়েও প্রত্যহ প্রায় তের চৌদ্দ মন জল বাষ্পাকারে শূন্যে ছড়িয়ে দেয়, যা মেঘে পরিণত হয়। আর ঐ রকম একটি বৃক্ষ হ'তে যে পরিমাণ ভিটামিন, প্রোটিন বিশেষ ক'রে আবহাওয়ার দূষণ নিরোধক অক্সিজেন প্রভৃতি পাওয়া যায়, সেগুলির আর্থিক মূল্য বিশ লক্ষ টাকার উপর ব'লে বর্তমানে মনে করা হচ্ছে। এই ঋণের কথা হয় স্মরণ করেই বৃক্ষ ও পশুর পরিচর্যা যজ্ঞাকারে নির্দিষ্ট হয়েছিলো, যাতে তারা পুষ্ট ও পোষণপ্রদ থাকে। বর্তমান শিল্পযুগে পশুর প্রতি আমাদের নির্ভরতা সামান্য কিছু কমলেও বৃষ্টি ও পরিবেশ শোধনের জন্য বৃক্ষের উপর নির্ভরতা কিছুমাত্র কমেনি। অথচ জনসাধারণ সেই বৈজ্ঞানিক ভূতযজ্ঞ কু-সংস্কার বলে ত্যাগ করেছে। এখন বিপদ বুঝে বিশ্বের রাষ্ট্রগুলি বন মহোৎসবের নামে একটা প্রহসন ক'রে চলেছে। কারণ তাদের বৃক্ষ রোপন আছে কিন্তু পরিচর্যা নেই। ফলে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ বৃক্ষশিশুর

শুকনো হাড়ে ভরে উঠেছে পথের পাশের ভাঙ্গা খাঁচাগুলি। রাষ্ট্রবিধি যেখানে ঋষির বিধান অনুসরণ করেনা, সেখানে অদূরদর্শিতার কুফল তো ফলবেই।

এই হলো পঞ্চ মহাযজ্ঞের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য বর্ণনা। এই কারণেই শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন- "যজ্ঞাশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ" অর্থাৎ যারা যজ্ঞের অবশেষ ভোজন করেন, মানে যজ্ঞাদির ব্যয় মিটিয়ে অবশিষ্ট অর্থে যাঁরা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, তারা সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত থাকেন। আজ আমাদের যজ্ঞ নেই কিন্তু তার অনুকৃতি ঘটেছে একটি বিকৃত আচারে। প্রত্যহ অন্ন গ্রহণের সময় পাঁচটি ভাত বা পঞ্চ গ্রাস ভাত ওঁ ক্যুর্মায় নমঃ নাগায় নমঃ এবং 'আব্রক্ষ্মস্তম্ব পর্যস্তৎ জগৎ তৃপ্যতু' বলে মাটীতে ফেলে জলের ছিটে দিয়ে নিজে উত্তম আসনে আহার ক'রে পঞ্চ-মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করা হচ্ছে। এ হলো সেই কল্পিত দেবতাদের অমার্জিত অসংস্কৃত স্থানে পাঁচটি ভাত নিক্ষেপ করে পাপমুক্ত হবার এক হাস্যকর চেষ্টা। যজ্ঞগুলির লক্ষ্য ছিল- মানুুষ যে যে উৎস থেকে পেয়ে বড় হয়, বেড়ে ওঠে, সেই সেই উৎসগুলিকে নিজের শ্রমে ও প্রচেষ্টায় পুষ্ট ও পোষণক্ষম ক'রে রাখা। আর কারও জন্যই কিছু না ক'রে, কারও ভালোর জন্য একটা আঙ্গুলও না তুলে, মাত্র পাঁচটি ভাত মাটিতে ফেলেই যে কাজ হয়ে যাবে, আর আমরা প্রকৃতির কাছ থেকে পুষ্টি ও পোষণ পাবো, প্রকৃতি এমন বেকুব নয় যে তাকে ফাঁকী

দেওয়া যাবে।বরঞ্চ বিশ্ব-বিধানের সুত্রানুযায়ী, ফাঁকী দিলে সেই ফাঁকীই পেতে হবে। তাইতো যুগ যুগ ধরে পঞ্চ-মহাযজ্ঞের নামে পাঁচটি ভাত মাটীতে ফেলে কেবল ফাঁকীই লাভ হচ্ছে, জীবন-যশ ও বৃদ্ধি আর ঘটছে না।

ভারতের যজ্ঞ ভাবনাগুলি, বহু প্রাচীন হলেও মনে হয়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হাতেই সেগুলির একটি আনুষ্ঠানিক বিকাশ ঘটে। শ্রীকৃষ্ণ যেমন অসাধারণ রাজনীতিজ্ঞ, তেমনি অপূর্ব সমাজ বিজ্ঞানীও ছিলেন। তা তাঁর এই পঞ্চ মহাযজ্ঞের প্রবর্ত্তন দেখেই বোঝা যায় । তাঁর কাল আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগেকার কাল। ইতিমধ্যে জগতের রাষ্ট্র ব্যবস্থা, সমাজ-বিধান, আবহাওয়া, যাতায়াত, খাদ্যাদির উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্ত্তন ঘটে গেছে। কাজেই এখন আর হুবহু সেই ব্যবস্থা ফেরানো সম্ভব নয়, এখন অবস্থার সঙ্গে তাল মিলিয়েই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তারই জের নাম ধর্ম্ম-সংস্থাপন । সে সাধ্য মানুষের নেই, নরের অসাধ্য সেই কাজ করতেই যুগে যুগে ঘটে সকলে নারায়ণের আবির্ভাব। আজ ধর্ম্মগ্লানির এই পূর্ণ লগ্নে, মরণভীত দিশেহারা মানুষের সামনে আবার জীবন, যশ ও বৃদ্ধির বাণী নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র । তিনিই বর্ত্তমান পুরুষোত্তম। তিনি প্রবর্ত্তন করেছেন, প্রকৃতির ঋণ শোধের নূতন কৃত্য। তাঁর প্রবর্তিত

যজন, যাজন ও ইষ্টভৃতিরূপ ত্রিযজ্ঞই সেই পঞ্চ মহাযজ্ঞের স্থান পূরণ করেছে সার্থকভাবে। এই ত্রিযজ্ঞ সম্পূর্ণ যুগোপযোগী।

যজ্ঞগুলির অনুষ্ঠান বিশ্বে যেখানে যেভাবেই করা হোক, তার মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষের জীবন বৃদ্ধির সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং প্রত্যেকের বিশ্ব-মানবতার অতীত ও বর্তমানের সাথে একাত্মতা স্মরণ ক'রে চলা। মানুষকে সর্ব্বদা স্মরণ করতে হবে যে সে কোন বিচ্ছিন্ন একটি সত্ত্বা নয়, তার জীবন-বৃদ্ধি কেবলমাত্র তার একার উপর সঙ্গে নির্ভর করে না, অতীত এবং বর্তমান, মানব সমাজের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের উপর নির্ভর করে। কেউ এখানে কেবল তার নিজের জন্য নয়, প্রত্যেকে সকলের জন্য এবং সকলেই প্রত্যেকের জন্য। সকলের সঙ্গে যোগেই প্রত্যেকের জীবন-বৃদ্ধির পূর্ণত্ব। তাই নিত্য সকলের জন্য প্রত্যেকের অবশ্য করণীয় আছে। সেই করণীয় না করলে পাতিত্য আসে, প্রকৃতির রক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে যায়, সে সমাজে মানুষ আর রক্ষা পায় না।

বর্তমান পুরুষোত্তম-প্রবর্তিত ত্রিযজ্ঞ যজন, যাজন, ইষ্টভৃতির মধ্যে এখানে যাজন ও ইষ্টভৃতির প্রাসঙ্গিক দিক নিয়ে কিছু আলোচনা করছি। যাজন, শ্রীশ্রীঠাকুরের এক অভিনব আবিষ্কার। যাজন ভারতে আগেও ছিলো। পুরোহিতগণ যজমানের বিয়ে, পৈতে প্রভৃতি যে সকল দৈব-কার্য্য করতেন

তাকেই যাজন বলে। সেই যাজনের প্রকার ভেদ ঘটিয়ে, তাকে যে এমন ব্যাপক ও সার্ব্বজনীন ক'রে একটা নূতন জাতির জন্মের কারণ করে তোলা যায়, জাতি ও রাষ্ট্রীয় সংহতির হাতিয়ার করে তোলা যায়, ধর্ম্মরাজ্য গঠনের উপাদান ক'রে তোলা যায়, এমন কি বিশ্বে এক-বিশ্ব রচনা ও বিশ্ব-রাষ্ট্র-সমবায়ের সংযোজন-সূত্র সেই দেশে সূত্র ক'রে তোলা যায়, এমন ভাবনা ইতিপূর্ব্বে কোন দূরদর্শী মনীষীর ভাবনার দিগ্বলয়েরও বাইরে ছিল। অথচ কত সহজে শ্রীশ্রীঠাকুর সেই যাজনকে বিপ্র-শূদ্র, মুর্খ-পণ্ডিত, নর-নারী নির্বিশেষে সকলের জীবনের নিত্যকৃত্য হিসাবে প্রচলিত ক'রে দিলেন। সেই যাজন আর কেবল দৈব-কার্য্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইলো না, মর্ত্যমানবকে দেব মানব ক'রে গড়ে তোলার প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়ে গেল। এ শক্তি মনে হয়, কেবল পুরুষোত্তমগণেরই থাকে। মানুষকে আপন করতে, পরস্পরকে পারস্পরিকতার, বান্ধব বন্ধনে আবদ্ধ করতে, রাষ্ট্রকে কল্যাণ পরিণত করতে এই যাজনের তুলনা নেই। অথচ এই যাজন ক্রিয়া চলাতে রাষ্ট্রকে বাজেটে অর্থ বরাদ্দ করতে হয় না, বিদেশী মুদ্রারও প্রয়োজন হয় না, জনসাধারণ আপন মঙ্গল বোধে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে অন্তরের তাগিদে কেমন করে ইষ্টানুগ যাজন ক'রে তা' আমরা ইতিমধ্যেই দেখতে পাচ্ছি, দেশে বিদেশে, স্বতঃ প্রেরণায় । ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের অশেষ কল্যাণকর এই যাজন-যজ্ঞ। সেই

যাজনের প্লাবন আসছে যা-কিছু অসৎ, অশুভ ও অশেষ, সমাজের মর্ম্মলোক থেকে তার মূল পর্য্যন্ত বিধৌত করে এই মর্ত্যকে স্বর্গ ক'রে তুলবে এই যাজন-যজ্ঞ| যদিও একথা অনস্বীকার্য যে প্রায় সৎসঙ্গী মাত্রেই স্বভাব-যাজক, তবু আরও গতি, আরও আন্তরিকতা ও আরও দক্ষ-দৃঢ়তা চাই| আমরা নিত্য পাঠ করি- আমি যাজন-জৈত্র| জৈত্র মানেই জয়শীল| চাই, এই প্রার্থনার সফল ও দ্রুত রূপায়ণ, তবেই দুর্ব্বল, মতিহীন অবিশ্বাসীরা বুঝবে| এই যাজন যজ্ঞ যদিও আজ দেশ বিদেশে ব্যাপকভাবে চলছে, তবু অবিশ্বাসীরা তা দেখতেও পায়না,শুনতেও পায়না| দৈবী আন্দোলন এমনি ভাবে প্রকাশ্যে অদৃশ্য হ'য়েই চলে, তাই অসুর তার কাছে পরাজিত হয়, রাজশক্তি তাকে রুখতে বা ধরতে পারে না, আর অবিশ্বাসী বিদ্বেষীরা নীরবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়| চিরকাল তাই হয়েছে, এখনও তাই হচ্ছে| যার চোখ আছে সে দেখে|

ত্রিযজ্ঞের মধ্যে যাজনের পরেই ইষ্টভৃতি যজ্ঞ| এই এক ইষ্টভৃতির মধ্যে পঞ্চ মহাযজ্ঞের তত্ত্বত তিনটি যজ্ঞ - ঋষিযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ ও নৃযজ্ঞ রয়েছে আর যুগোপযোগী অর্থে ভূতযজ্ঞও রয়েছে| একথা সকল সৎসঙ্গীই জানেন| যজ্ঞের প্রকৃত তাৎপর্য্য যদি বিশ্ব-পোষণ হয়, তবে এই ইষ্টভৃতি নিয়ে তাঁর, বিশ্বজোড়া মানব কল্যাণের যে

সুদূর প্রসারী ভাবনা রয়েছে, তা তাঁর নানা দিনের আলোচনার মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। তা থেকে দু' একদিনের কথা এখানে তুলে দিচ্ছি।

সে ১৯৪০ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারীর কথা। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন পাবনা- আশ্রমে পদ্মার বাঁধের ধারে বসে সকালে কথাবার্তা বলছিলেন, কাছে কেষ্টদা (ঋত্বিগাচার্য) সহ আরও কিছু লোক ছিলেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি হিসাব ক'রে বললেন- "ঋত্বিক অধ্বর্য্যুদের পক্ষে দু'চারশ টাকা আশীর্ব্বাদী গ্রহণ করা কঠিন ব্যাপার কিছু নয়। এমন হবে যে, ভালো লোক সব এই দিকে চলে আসবে...... ..... । **প্রত্যেক ঋত্বিকের সঙ্গে আবার তার Staff (কর্মীবৃন্দ) থাকবে, ডাক্তার থাকবে, ইঞ্জিনীয়ার থাকবে, কৃষিবিদ থাকবে, বিজ্ঞানী থাকবে— হয়তো এক জায়গায় বৃষ্টি হচ্ছে না, অমনি ঋত্বিকের মাথায় টনক নড়ে যাবে, তার দল গবেষণা শুরু করে দেবে। এরা সর্ব্বভাবে মানুষকে Service (সেবা) দেবে। আর ইষ্টভৃতিরর উদ্বৃত্তটা Controll (সুনিয়ন্ত্রিত) করতে হয় - যে থানায়**

১০,০০০ লোক ইষ্টভৃতি করে সেখানে ১৫,০০০ টাকা বছরে উদ্বৃত্ত হয় – তা দিয়ে সেই থানার মঙ্গলকর কাজ যদি করা যায় তবে আর কারও পায়ে তেলাতে হয় না। কোনবার হয়তো খাল কেটে দিলো, কোনবার Electric Installation (বৈদ্যুতিক প্রতিষ্ঠা) হলো– স্কুল হলো- এই সব কাজ চলতে থাকবে।

এই হিসাবটা ৫০ বছর আগেকার, যখন এক টাকার দাম এক টাকাই ছিলো, এখনকার মতো ৯/১০ পয়সায় নেমে যায়নি। তখন লোকে সাধারণতঃ তখনকার তিন পয়সা ক'রে ইষ্টভৃতি করতো। সেই সময় পনের হাজার টাকা দিয়ে অনেক কিছু করা যেতো। বর্তমানে লোকে যে রকম ইষ্টভৃতি করে তাতে সেই উদ্বৃত্তটা বহুগুণ বাড়ার কথা। **কিন্তু ইষ্টভৃতির উদ্বৃত্ত কি তা আজ অনেকেই বুঝতে পারেন না। অথচ কথাটি স্বয়ং ঐ শ্রীঠাকুরের শ্রীমুখ নিঃসৃত । উপরোক্ত কথাগুলি প্রথম ছাপা হয় 'আলোচনা' পত্রিকার ২য় বর্ষের (১৩৫৭ সাল) কার্ত্তিক সংখ্যায়**

৬৪৪ পৃষ্ঠায় । এই দীন লেখকই তখন ‘আলোচনা'র সম্পাদক ছিল। কিন্তু ঐ কথোপকথন যখন গ্রন্থাকারে 'আলোচনা প্রসঙ্গে' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে পুনর্ম্মুদ্রিত হয়, তখন কোন অজ্ঞাত কারণে উপরোক্ত আলোচনার নিম্নরেখ অংশটুকু একেবারেই বাদ দেওয়া হয়েছিলো। (আঃ প্রঃ ১ম খন্ড ও ৫/২/৪০ তাং প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য) কে বাদ দিয়েছিল কেনই বা বাদ দেওয়া হয়েছিল, তা আমার জানা নেই, তবে এই বাদের ফলে মানুষ পুরুষোত্তম কথিত ইষ্টভৃতির উদ্বৃত্ত সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ হয়ে আছে। সৎসঙ্গ আন্দোলনের এই অতি গুরুত্বপূর্ণ মঙ্গলযজ্ঞের অর্থনৈতিক বনিয়াদকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টার ফল হয়েছে মারাত্মক। এতে এই আন্দোলনকে পিছন থেকে ছুরি মেরে দুর্ব্বল, বিকৃত ও বিলোপ করার চেষ্টা হয়েছে। এ চেষ্টা চিরদিন ফলবতী হবে না, প্রেরিত পুরুষগণ পরাজিত হবার জন্য আসেন না। পূর্ব্বোক্ত নিম্নরেখ কথাগুলি এখনও ‘আলোচনা' পত্রিকার উক্ত সংখ্যায় ছাপা রয়েছে, যে-কেউ তা মিলিয়ে দেখতে পারেন। একদিন কোন শক্তিধর পাবক পুরুষ এসে ঠিকই সব খুঁজে বের

করবেন, পুরুষোত্তমের সম্বন্ধে যা কিছু গুপ্ত ও গুহ্য আছে সবই তিনি জনসমক্ষে প্রকাশ ক'রে দেবেন। সেদিন আমরা থাকবো না, কিন্তু ইতিহাস থাকবে । আজ পাঁচ হাজার বছর ধ'রে কৃষ্ণদ্বেষী কংস, দু'হাজার বছর ধ'রে খ্রীষ্টদ্বেষী জুডাস্ ইতিহাসে অভিশপ্ত হ'য়ে আছে । এবার হয়তো সেই সাথে আরও দুই একটি নাম যুক্ত হবে। ইষ্টভৃতির, মানুষের জীবন নিংড়ান অর্ঘ্য যে কোন ব্যক্তির, পরিবারের বা দলের কেবল খাওয়া পরা, খেয়াল খুসী বা আরাম বিলাসের জন্য নয়, তা আর একদিনের কথায় তিনি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছিলেন। সে ১৯৪৫ সালের ১লা আগষ্টের কথা । খবরের কাগজ থেকে একটা পল্লী উন্নয়নের পরিকল্পনার কথা তাঁকে পড়ে শোনানো হলো। সব শুনে তিনি বললেন "যতই যা করা হোক, ভারতের ২৫০ জেলার জন্য প্রয়োজন অন্ততঃ ২০০০ ঋত্বিক। তাদের চাই ভাগবত ঐক্যের প্রতিভূকে কেন্দ্র ক' রে সুপ্রজনন, কৃষি, পূর্ত্তকর্ম্ম এবং শিক্ষা নিয়ে বৈশিষ্ট্যপালী সংবর্দ্ধনী সংহতির পথে অগ্রসর হওয়া। এ বাদ দিয়ে কিছু হবার নয়। আর আমি যে

বলেছি— “বিঘা প্রতি আড়াই কাঠা / রুজির আড়াই আনা,ইষ্টসেবায় অর্ঘ্য দিয়ে / বৃদ্ধিতে চল টানা।”

তা’ চলা ছাড়া এ সব বিরাট পরিকল্পনার ব্যয় ভার বহন করা সম্ভব নয়।” (আঃ প্রঃ ৬/৯৩) **(বিঃদ্রঃ এই পুস্তকের প্রথম প্রকাশঃ নভেম্বর ' ১৯৯০)**

তাহলে ইষ্টভৃতির মূল উদ্দেশ্য এই। ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্র পর্য্যন্ত বিশাল লোক কল্যাণের জন্যই এই পরিকল্পনা। আজ এই ১৯৯০ সালেও যদি সমস্ত ইষ্টার্ঘ্য ইষ্টনির্দ্দেশিত পথে লোক কল্যাণে বায়িত হয়, তাহলে সৎসঙ্গের লোক-পাবনী আন্দোলন অভূতপূর্ব্ব গতিবেগ লাভ করবে এবং বিশ্বজন চিত্তে অসীম শুদ্ধাপ্লুত গুরুত্ব লাভ করবে। সেই ইষ্টার্ঘ্য ইষ্টেচ্ছা ও নির্দ্দেশ অমান্য ক'রে যদি কেউ আপন খেয়াল যা বুদ্ধিমত অন্য কাজে ব্যয় করেন, মহাকালের হাতে তার বিচার অনিবার্য্য।

যাঁরা নিত্য বিধিমত এই যজ্ঞ পালন করে চলেছেন, তাঁরাই প্রকৃতির কাছে ঋণমুক্ত থাকছেন। যাঁরা রুজির (উপার্জনের) আড়াই আনা হিসাবের বেশী অর্থ প্রদান করেন, প্রকৃতিই তাঁদের কাছে ঋণী

হয়। প্রকৃতি কারও ঋণ রাখে না, খুসী হয়ে বহুগুণ বেশী প্রদান করে। তাদের পুরুষাকারের সাথে অর্থাৎ ইষ্টানুগ জীবন-বৃদ্ধির প্রচেষ্টার সাথে দৈব অনুকূল হ'য়ে যুক্ত হয়। এটাই ভগবৎ বাক্য ও বিধান। পুরুষাকারের সাথে দৈব যখন অনুকূল হ'য়ে যুক্ত হয় তখনই কর্মে সাফল্য ও সার্থকতা আসে।

"যতই আসুক আপদ বিপদ / যেমনই হোক প্রাণ / ইষ্টভৃতি আনেই আনে / সবার পরিত্রাণ।" শ্রীশ্রীঠাকুর

অবশ্য বর্ত্তমান পুরুষোত্তম যাদের আদর্শ নন, ইষ্ট বা গুরু নন, তাদের কাছে এই সব কথার তাৎপর্য্য উদঘাটিত হবে না, যারা তাঁকে ভাল বেসেছেন, প্রিয়পরম হিসাবে গ্রহণ করেছেন, কথার তাৎপর্য্য অর্থপূর্ণ হ'য়ে তাদেরই কাছে কেবল প্রকাশ পাবে। শুধু তাই নয়, তাঁরাই পারস্পরিকতা সৃষ্টি ক'রে বান্ধব-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে চলতে আরম্ভ করেছেন। একাদর্শ অবলম্বন ক'রে তাঁরা পরস্পর সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে সংহত সমাজ সৃষ্টির কারণ হচ্ছেন। সংহতিই শক্তির জননী, শক্তিই জগতে মানুষকে সম্বর্দ্ধিত করে। যারা শক্তিহীন

তারা বহুগুণের নায়ক হলেও জগতে অবমানিত, লাঞ্ছিত ও হীন জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়।

একজন বড় ব্যবসায়ী, বড় চাকুরে ইত্যাদি বহু ধনসম্পদ উপার্জ্জন করেও যখন যজ্ঞ অর্থাৎ জগতের কাছে তার ঋণ-মুক্তির জন্য কিছু না ক'রে নিজের উপার্জ্জন কেবল নিজেই ভোগ করে তখন সে পাপ ভোজন করে, শ্রীকৃষ্ণের এই কথা আগেই বলা হয়েছে। এই পাপ মানে প্রকৃতির রক্ষা ব্যবস্থা থেকে পতিত হওয়া। সুতরাং বহু-উপায়ী ক্ষমতাধর মানুষও যদি যজ্ঞবিহীন হয়, অর্থাৎ পরস্পর বান্ধব বন্ধনে আবদ্ধ হ'য়ে না চলে, তবে তার সমস্ত ধনৈশ্বর্য স্রোতে ভাসন্ত শেয়ালার মতোই ক্ষণস্থায়ী, অকস্মাৎ একটি সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা, রাজনৈতিক দাঙ্গা বা স্বার্থের সংঘাতে ঐ শেয়ালার মতোই সে যে কখন কোন অতলে তলিয়ে যাবে তা কেউ জানে না। বহু মানীর মান, চোখের জলে ধুলায় লুটাবে সেদিন। কেননা জগতে তার কেউ আপন নেই। সেদিন তাকে রক্ষার জন্য সমাজের একটি বাহুও উত্তোলিত হবে না, কেননা সেও কখনও কারও রক্ষার জন্য, নিজ বাহু উত্তোলন করেনি।

এই বাহু উত্তোলন করাই, অর্থাৎ পরিবেশ পারিপার্শ্বিকের মঙ্গলের জন্য বাস্তবে কিছু করার নামই যজ্ঞ। সেই যজ্ঞের মনোভাব দিয়েই ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেছেন। যে মানুষ সেই মনোভাবকে অবজ্ঞা করে সে ঈশ্বরেরই অবমাননা করে। প্রকৃতির হাতে তার রেহাই নেই, তা সে একটা বিচ্ছিন্ন মানুষই হোক, একটা দলই হোক বা একটা গোটা জাতই হোক। এই কথাই পূর্ব্বতন পুরুষোত্তমগণ যেমন বলেছেন, বর্তমান পুরুষোত্তমও বিশেষ জোর দিয়ে বার বার ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন যে এই যজ্ঞের অল্পই হোক বিস্তরই হোক, যারা আন্তরিকতার সাথে তার যতটা অভিব্যক্তি দেবে, তাদের জগতে কেউ সাবাড়ে নিয়ে যেতে পারবে না। তা না করলে এক মহা বিনষ্টি বা ধ্বংস থেকে তাদের কেউ বাঁচাতে পারবে না।

সুতরাং যারা নিজেরা অবজ্ঞা ক'রে এই যজ্ঞ পালন করবেন না বা ঐ যজ্ঞের অর্ঘ্যাদী লোক কল্যাণে ব্যয় না করে আত্মভোগে বা বৃত্তিভোগে ব্যয় করবেন, তারা মহাপাপ করবেন এবং প্রকৃতির রুদ্র রোষে তারা বিনষ্ট হবেন, এটাই ঈশ্বরের বিধান। অতএব সাধু সাবধান।

।। সমাপ্তি।।